রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

কক্সবাজারে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষদের চিন্তা

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

আঞ্চলিক ভাষা ও দুর্গা

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা চিন্তিত

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু **১৪** × বুধবার, ৩১ অক্টোবর ২০১৮

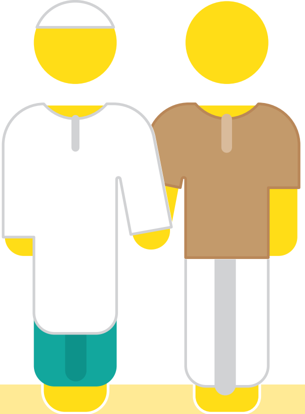

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক কি পাল্টেছে?

সূত্র: ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে অক্টোবরের মধ্যে ইন্টারনিউজের ১৭ জন জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতা এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের ১পূ, ১প, ২পূ, ২প, ৩ এবং ৪ নং ক্যাম্প থেকে কোবো কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা মতামত। বাংলাদেশে পালিয়ে আসার পরে হিন্দু এবং মুসলমান রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কে কি ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে তা তুলে ধরার জন্য মোট ১০৯৮টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইংরেজি এবং বাংলা লিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষায় মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ইন্টারনিউজ

২৩ সেপ্টেম্বর - ২০ অক্টোবর, ২০১৮

মোট মতামত		
১০৯৮	৬৮০	৪১৮

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

> আমরা একে অন্যকে আমাদের উৎসব এবং বিয়েতে আমন্ত্রণ জানাতাম। আমাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন নেই, কিন্তু তবু আমাদের মনে হয় ওদেরও আমাদের মতই ন্যায় বিচার আর অধিকার পাওয়া উচিৎ।"
>
> – নারী, ২৯, মুসলিম, ক্যাম্প ৩

> জীবন আগে ভালোই ছিল। কেবল ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ভেদাভেদ ছিল না। ওরা দেখতেও আমাদের মতই ছিল। তবে আমি মনে করি না যে আমরা আর কখনোই আগের মত ওই সম্পর্কে ফিরে যেতে পারবো। কারণ ওদের কারণে আমরা আমাদের লোকজন হারিয়েছি। এখন আমরা এমন এক দেশে বাস করছি যা আমার নয়।"
>
> – পুরুষ, ২৫+, হিন্দু, ক্যাম্প ১পঃ

প্রাপ্ত মতামত থেকে এটাই প্রতিফলিত হয় যে, মায়ানমারে থাকতে হিন্দু এবং মুসলমান রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই জানিয়েছেন যে, যেহেতু তাদের সম্প্রদায়ে কোনও নাপিত ছিল না সেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাপিতেরা তাদের এলাকায় এসে প্রতি সপ্তাহে চুল কেটে দিয়ে যেতেন। আর বিনিময়ে টাকা দেওয়া পরিবর্তে মুসলমানরা বছর শেষে তাদের চাল দিতেন যাতে নাপিতরা তাদের পরিবারকে সারা বছর খাওয়াতে পারেন। এতে বোঝা যায়, বেঁচে থাকার জন্য তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।

জীবিকার জন্য নির্ভরশীলতার পাশাপাশি দুই সম্প্রদায়ের মানুষই জানিয়েছেন যে তারা কিভাবে একই সাথে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতেন এবং সামাজিক সমাবেশে একত্রিত হতেন। হিন্দু এলাকায় মুসলমানদের যাওয়া-আসা এবং দুই সম্প্রদায়ের একসাথে খাওয়াদাওয়া করা সাধারণ ব্যাপার ছিল। বহু উত্তরদাতাই বলেছেন যে ধর্ম ছাড়া দুটি সম্প্রদায়ের চেহারা এবং সংস্কৃতিতে তারা তেমন পার্থক্য দেখতে পেতেন না এবং তাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।

> “ধর্ম নিয়ে আমাদের মধ্যে কখনোই কোনও বিবাদ হয়নি। এটা শুরু হয়েছিল কারণ সেনারা হিন্দুদের মুসলমান ভেবে নির্যাতন করেছিল। আর আমরা শুনেছি যে মায়ানমারের সেনাদের নির্দেশে হিন্দুরাও আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।”
>
> – নারী, ২১, মুসলিম, ক্যাম্প ২পঃ

> “ওরা ছিল আমাদের ভাইয়ের মত। কিন্তু আমরা ওদের কারণে অনেক কষ্ট পেয়েছি। ওদের জন্য আমরা আমাদের মানুষ আর বাড়িঘর হারিয়েছি। কিছু লোক বলেছে যে বর্মী সেনা নয়, বরং মুসলমানরাই আমাদের লোকদের মেরেছে।”
>
> – পুরুষ, ৩২, হিন্দু, ক্যাম্প ১পঃ

প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে অবনতি ঘটতে শুরু করে যখন উভয়ের মনেই এই ধারণা দানা বেঁধেছিল যে অপর পক্ষই তাদের দুর্দশার কারণ। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সহমর্মীতা রয়েছে কারণ তারা মনে করেন হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতিত হয়েছিল, মারা গিয়েছিল, আশ্রয় হারিয়েছিল বার্মিজ সেনারা তাদের মুসলমান মনে করার কারণে। অন্য দিকে কেউ কেউ মনে করেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বার্মিজ সেনাদের নির্দেশে মুসলমানদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বলেছেন যে মুসলমানদের কারণে তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তাদের মতামতে এই ধারণা উঠে এসেছে যে মুসলমানদের কারণেই তাদের সম্প্রদায়ের উপর বর্মী সেনারা হামলা করেছিল এবং তাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রাণ হারাতে হয়েছে। কেউ কেউ আবার মনে করেন মুসলমান সম্প্রদায়ও ওই হামলায় অংশ নিয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের বিবৃতিগুলিতে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে আগে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে তাদের মনে একে অপরের প্রতি রাগ ও অবিশ্বাস রয়েছে।

> “আমরা বাংলাদেশে আসার সময় খাবার ভাগ করে খেয়েছি আর একে অপরকে সাহায্য করেছি। এখন, যদিও আমরা আলাদা আলাদা ক্যাম্পে বাস করছি, তবু আমদের দেশ একটাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যেমন আমাদের দেশে ফিরে যেতে চাই, মাতৃভূমিতে, ওরাও আমাদের মতোই সেটাই চায়। আমরা শুধু আমাদের জন্যই ন্যায়বিচার চাই না, আমরা ওদের জন্যেও সেটা চাই।”
>
> – পুরুষ, ৪৯, ক্যাম্প ১পঃ

> “আমি জানি না আমরা আর আগের মতো হতে পারবো কি না। আমরা জানি না মুসলমানরা আমাদের লোকদের মেরেছিল কি না। আমরা এখানে একসাথে এসেছি। কিন্তু আমরা আমাদের দেশে ফিরে যেতে চাই। আমরা আবার আগের মতই হতে পারি যদি ওরা আমাদের সাথে আসে। আমরা ন্যায়বিচার চাই।”
>
> – নারী, ৩৮, হিন্দু, ক্যাম্প ১পঃ

মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা জানিয়েছেন যে যখন হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাংলাদেশে পালিয়ে আসছিলেন তখন তারা পথে একে অপরকে সাহায্য করেছেন। তারা মনে করেন যে, মায়ানমার যতটা তাদের দেশ, ঠিক ততটাই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরও দেশ এবং মায়ানমারে সেনা অভিযানের সময় তারাও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের মতোই একই ধরনের কষ্ট পেয়েছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরাও তাদের মতোই মায়ানমারে ফিরে যেতে চান। ধর্মীয় পরিচিতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা সেই সমস্ত মানুষদের জন্য ন্যায়বিচার চান যারা এই কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মতোই হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলেছেন যে তারা নিশ্চিত নন যে তাদের লোকেদের আসলে কে অত্যাচার করেছে, মেরেছে; মুসলমানরা নাকি বর্মী নাগরিকরা? তারা ন্যায় বিচার চান এবং তাদের দেশে ফিরে যেতে চান। তারা এও জানিয়েছেন যে অবস্থার পরিবর্তন হলে তারা আবারো আগের মতন মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে পারবেন।

দুই সম্প্রদায়ের মানুষই মনে করেন যে ধর্ম আলাদা হলেও তাদের দেশ একটাই এবং তারা তাদের আদি ভূমিতে ফিরে যেতে চান এবং সম্মান ও শান্তির সাথে বসবাস করতে চান।

কক্সবাজারে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা রুজি রোজগার এবং পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত

সূত্র: ৭ই অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কক্স বাজারের শামলাপুর হাই স্কুলে রেকর্ড করা বেতার সংলাপ নামক আলোচনামূলক রেডিও অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশী শ্রোতাদের থেকে সংগ্রহ করা মতামত। এই পর্বটি এমন একটি এলাকায় রেকর্ড করা হয়েছিল যেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রচুর মানুষ বসবাস করেন এবং সেই কারণে শ্রোতাদের বেশিরভাগই এই সব মানুষেরা ছিলেন এবং এই বিশ্লেষণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এই সমস্ত মানুষদের নানান আশংকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি ইউনিসেফ ও বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ বেতার প্রযোজনা করেছে।

কক্সবাজারে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা এই অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের আগমনের পর থেকে তারা যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সেই সম্পর্কে জানিয়েছেন। এদের অনেকেই বাজারে শাকসবজি, মাছ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করার মতো ছোটোখাটো ব্যবসা করে দিন চালান। কিন্তু তাদের মনে হচ্ছে যে ইদানীং রোহিঙ্গারা তাদের ব্যবসার সিংহ ভাগ দখল করে নিয়েছে এবং তারা শুধু ক্যাম্পেই নয়, বরং স্থানীয় বাজারেও বিক্রি বাট্টা করছেন। তারা এমনও মনে করছেন যে মাছের বাজার দরও রোহিঙ্গারাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। কম লাভ রেখে মাছ বিক্রি করেন বলে রোহিঙ্গারা জেলেদের কাছ থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দরে মাছ কিনতে পারেন।

> আমরা ১ কেজি মাছ ৫০ টাকায় কিনতাম। কিন্তু রোহিঙ্গারা একই মাছ বেশী দামে কিনছে আর এই কারণে আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে।"
>
> – পুরুষ, ৫৫, মাছ ব্যবসায়ী

তাদের মতে রোহিঙ্গাদের আসার ফলে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং সেই কারণে তাদের দিন চালানো আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। কিছু স্থানীয় মানুষজন এই কথাও বলেছেন যে তারা আগে জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে এনে এলাকার বাজারে বিক্রি করে টাকা রোজগার করতেন কিন্তু এই কাজটাও এখন খুব কঠিন হয়ে উঠেছে, কারণ জঙ্গলের বিশাল একটা অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। মানুষ আরও বলেছেন যে রোহিঙ্গারা জঙ্গলের বাকি অংশ থেকে জ্বালানি কাঠ যোগাড় করে এবং স্থানীয় মানুষেরা জঙ্গলে তাদের সামনাসামনি হতে ভয় পান।

> যখনই আমরা কাজের জন্য বাইরে যাই, রোহিঙ্গারা আমাদের গালাগাল দেয় আর চেঁচামেচি করে। আমরা সবসময় ওদের ভয় পাই। আমরা ভয় পেয়ে কাজ করা বন্ধও করে দিই।"
>
> – পুরুষ, ৩৫, দিন মজুর

কক্সবাজারে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা একথাও বলেছেন যে তারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারেও চিন্তিত আছেন। তাদের মতে, জঙ্গল আর গাছপালার এই বিপুল ক্ষতির কারণে তাদের এলাকার তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

তারা এলাকায় স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আশংকায় আছেন। তারা মনে করেন, রোহিঙ্গারা আসার পর থেকে তারা নানান অসুখবিসুখে ভুগছেন এবং এইচআইভি-এইডসের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বলে ভয় পাচ্ছেন।

আঞ্চলিক ভাষা ও দুর্গা: রোহিঙ্গা ভাষার উপর ধর্মের প্রভাব

কুতুপালং মেগা ক্যাম্পের ঠিক বাইরে থাকা ছোট ক্যাম্পটাতে ঢোকার আগে থেকেই উৎসবের আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছিল। সংখ্যায় মাত্র ২০০টি পরিবার হলেও, হিন্দু রোহিঙ্গারা তাদের দেবী দুর্গাকে আবাহন জানানোর জন্য মাইকে একই সাথে বলিউড আর ভক্তিগীতি বাজিয়ে একটা বেশ জমকালো সমারোহের আয়োজন করেছিল। এই সম্প্রদায় তাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকলেও, আমাদের অবাক করে দিয়ে তারা সাগ্রহে তাদের ভাষা নিয়ে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন। ক্যাম্পে ঢোকার সময় আমাদের নমস্কার (সংস্কৃত নমস্কারম থেকে নেওয়া) বলে স্বাগত জানানো হয়েছিল, যেখানে মুসলমান রোহিঙ্গারা হলে সালাম (আরবি থেকে নেওয়া) জানাতেন।

ধর্ম যে ভাষার বিকাশে প্রভাব ফেলে একথা মাথায় রেখেই আমরা হিন্দু আর মুসলমান রোহিঙ্গাদের ভাষার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে চেয়েছিলাম। যেহেতু হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষা হল সংস্কৃত, তাই হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যে শব্দগুলো সরাসরি ধর্মীয় কাজকর্ম বা আচার-আচরণের সাথে যুক্ত, যেমন 'প্রার্থনা' (শাদোনা) এবং 'পুরোহিত' (বোন, ব্রাহ্মণ থেকে) সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। মুসলমান রোহিঙ্গাদের কথায় এই শব্দগুলিকে নামাজ এবং ইমাম বলা হয় যা যথাক্রমে ফার্সি এবং আরবি ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার প্রভাবের ফলে হিন্দু রোহিঙ্গাদের ভাষার সাথে চাটগাঁইয়া ও বাংলা ভাষার মিল অনেক বেশি। এই কারণে অন্যান্য ক্যাম্পের

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রোহিঙ্গাদের তুলনায় এই হিন্দু রোহিঙ্গাদের সাথে যোগাযোগের সময় ত্রাণকর্মীরা কম সমস্যার সম্মুখীন হন।

যাইহোক, ভাষার ওপর ধর্মের প্রভাব মন্দির এবং মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই প্রভাব রোজকার জীবনে বলা নানান কথার ওপরেও পড়েছে।

বিশ্বাস এবং পরিবার

এই দুটি ধর্মে আত্মীয়তা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলোও আলাদা। ভাই, বোন, খালা, চাচা এবং আরও অনেক সম্পর্ক বোঝাতে দুটো ধর্মে আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া এবং মুসলমানরা আরবি, পার্সি, এবং উর্দু ভাষা থেকে নেওয়া শব্দ ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসেবে যেখানে হিন্দু রোহিঙ্গারা স্ত্রীকে ত্রি (সংস্কৃত স্ত্রী থেকে) বলেন সেখানে মুসলমান রোহিঙ্গারা বলেন বিবি (উর্দু থেকে নেওয়া)।

এমনকি 'পুরুষ' এবং 'নারী' বোঝাতেও আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। হিন্দু রোহিঙ্গারা 'পুরুষ' বোঝাতে ফুরুশ (সংস্কৃত পুরুষ থেকে নেওয়া) শব্দটি ব্যবহার করেন এবং মুসলমান রোহিঙ্গারা বলেন মরোত (পার্সি মরদ থেকে নেওয়া)। 'মহিলা' বোঝাতে মুসলমানরা মায়া-ফুয়া শব্দটি ব্যবহার করেন এবং হিন্দুরা মহিলাই বলেন।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

মুসলমান রোহিঙ্গারা বলেন যে তাদের বিয়ারামের (রোগ/অসুখ) জন্য তাদের দাবাই (ওষুধ) দরকার। এই দুটো শব্দই নেওয়া হয়েছে অন্যান্য মুসলমান সংস্কৃতি থেকে -দাবাই আরবি থেকে এবং বিয়ারাম পার্সি থেকে। হিন্দু রোহিঙ্গারা কিন্তু যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন তা বাংলা ভাষার বেশ কাছাকাছি - ওষুধ বোঝাতে ওশুত এবং অসুখ বোঝাতে ওশুক-বিশুক। আর এই কারণেই এই মূল শব্দগুলো থেকে যে অন্যান্য শব্দ তৈরি করা হয়েছে সেগুলোও আলাদা হবে সেটাই স্বাভাবিক। যেমন, মুসলমানরা 'চিকিৎসা' বোঝাতে দাবাই গরন বলেন। দাবাই কথাটা হিন্দু রোহিঙ্গারা ব্যবহার করেন না, তাহলে তারা 'চিকিৎসাকে' কি বলবেন? এর জন্যও তারা সংস্কৃত থেকে নেওয়া শব্দ ছিগিসসা (বাংলা চিকিৎসার সাথে মিল লক্ষণীয়) ব্যবহার করেন।

তবু আনন্দ খুশিই থাকে

যদিও আমরা দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভাষাগত পার্থক্য তুলে ধরলাম, তবু তারা কিন্তু একে অপরের কথা খুব সহজেই বোঝেন কারণ তারা ধর্মীয় প্রভাবের কারণে হওয়া এই ভাষাগত পার্থক্যগুলোর ব্যাপারে জানেন। তবুও মানুষ তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের এই নিজস্ব শব্দগুলো বলাই পছন্দ করেন।

এমন কিছু শব্দ আছে যা ধর্মীয় বা ধর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত মনে হলেও, উভয় সম্প্রদায়ই সেগুলি ব্যবহার করে। শান্তি, অর্থাৎ শান্তি শব্দটির সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু সংস্কৃতির সাথে গভীর যোগাযোগ থাকলেও মুসলমান রোহিঙ্গারাও সমানভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। 'গর্ভবতী' বোঝাতে হিন্দুরাও আরবি শব্দ হামিল ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষায় 'পানি' বোঝাতে দুই ধর্মের মানুষেরা প্রায়ই আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করে থাকলেও (মুসলমানরা 'পানি' বলেন, আর হিন্দুরা বলেন 'জল'), রোহিঙ্গাদের সবাই একে বলেন 'ফানি'।

একজন 'খুশি' কিংবা 'ফেরেশান' মানুষ বলতে বোঝায় যথাক্রমে একজন 'আনন্দিত' কিংবা 'বিচলিত' মানুষ – হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই একই শব্দগুলি ব্যবহার করেন। ক্যাম্প থেকে চলে আসার আগে আমরা কয়েকজন নারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে দুর্গাপূজা তাদের কেমন লাগছে। কঠিন কিছু মনোসামাজিক শব্দ জানতে পারবো এই প্রত্যাশায় আমি আমার খাতা কলম নিয়ে তৈরি ছিলাম। কিন্তু তাঁরা কেবল হাসলেন, আর সবচেয়ে প্রবীণ নারীটি সবার হয়ে উত্তর দিয়ে দিলেন।

> "কেমন আবার লাগবে?
> আমরা খুশি। খুব, খুব খুশি।

হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আশ্রয় ও রসদ নিয়ে সবচেয়ে বেশী চিন্তিত

সূত্র: ২০১৮ সালের অক্টোবরে ক্যাম্প ১ (পশ্চিম হিন্দু পাড়া) এ বসবাসকারী হিন্দু রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষের জন্য বি.বি.সি. মিডিয়া অ্যাকশনের আয়োজন করা বিষদ সাক্ষাৎকার ও ছোট ছোট ফোকাস দলে আলোচনা।

ক্যাম্পে বসবাসকারী হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত। তাদের মতে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যথেষ্ট ডাক্তার বা ওষুধ নেই, আর সেগুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যেই খোলা থাকে। তাই স্বাস্থ্যসেবা পেতে তাদের প্রায়ই নিজের ক্যাম্প থেকে লুকিয়ে বের হতে হয় (ক্যাম্প এলাকার বাইরে তাদের চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা আছে) আশেপাশের ক্যাম্পে কিংবা স্থানীয় বাংলাদেশী ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার জন্য। তারা বলছেন যে এভাবে চিকিৎসা করাতে অনেক খরচ হয়। যেমন, একজন ডাক্তার দেখাতে তাদের ৪০০-৫০০ টাকা দিতে হয়। তাই চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে বেশিরভাগ হিন্দু রোহিঙ্গা ত্রাণে পাওয়া জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছেন। অন্যান্যরা বিভিন্ন সংস্থার জন্য দিনমজুর হিসাবে কাজ করে দিনে ৪০০-৫০০ টাকার মত আয় করছেন।

> "আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা চিকিৎসা নিয়ে। আমাদের ক্যাম্পে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, কিন্তু সবসময় সেখানে ডাক্তার থাকে না। প্রতিদিনই ডাক্তার দেরি করে আসেন আর ওষুধ হিসাবে দেওয়া হয় শুধু প্যারাসিটামল আর স্যালাইন। তাই চিকিৎসার জন্য আমাদের ক্যাম্পের বাইরে যেতে হয়।"
>
> – পুরুষ, ৩০, ক্যাম্প ১ (হিন্দু সম্প্রদায়)

হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আরেকটি বড় দুশ্চিন্তা নিরাপত্তা নিয়ে। তারা বলছেন, আলোর অভাবে সন্ধ্যাবেলা ক্যাম্পের ভেতর চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাম্পের ল্যাট্রিনগুলো শেল্টার থেকে বেশ কিছুটা দূরে, তাই রাতের বেলা সেগুলোতে যেতে তারা ভয় পান।

হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এই ভয়ও পান যে মুসলমান রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের আক্রমণ করবে কারণ তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা বলছেন যে, মায়ানমারে থাকতে মুসলমান রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে তাদের খুবই

ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তারা মনে করেন যে ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে, মায়ানমার সেনাবাহিনীর আক্রমণের পর থেকে সেই সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করেছে। তারা বলছেন যে সেই সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যরা আরাকান জঙ্গি সংগঠনের সাথে যোগ দেয়, এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদেরও যোগ দিতে বলে যাতে শুধুমাত্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এতে রাজী হয়নি এবং তাদের মতে, এর পর থেকেই মুসলমান রোহিঙ্গারা তাদের উপর জুলুম করতে শুরু করে।

হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় তাদের শেল্টার নিয়েও চিন্তিত। ঘর বানাতে তাদেরকে যেসব জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তাদের মতে ভালো মানের ছিল না এবং তারা বলছেন যে, প্রথমবার যে বাঁশ ও তেরপল দেওয়া হয়েছিল তারপর থেকে তারা বাড়ি বানানোর আর কোনও জিনিসপত্র পান নি। তাদের মতে এটা সমস্যা তৈরি করেছে এবং তারা বর্ষার সময়ে কিভাবে ঘর ভেঙে পড়বে এই আতঙ্কে ছিলেন এবং ছাদ থেকে পানি পড়ার ফলে মেঝেতে ঘুমাতে পারছিলেন না তা জানিয়েছেন।

এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা যথেষ্ট পরিমাণ ত্রাণ না পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন এবং জানিয়েছেন যে ত্রাণ সংগ্রহের জন্য তাদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা বলছেন যে, ক্যাম্পের ভেতরে কোনও বিতরণ কেন্দ্র নেই, আর সবচেয়ে কাছের সেনা ক্যাম্প থেকে ত্রাণ নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে ২০-৩০ টাকা যাতায়াতে খরচ করতে হচ্ছে। তারা যদিও জ্বালানি কাঠ পেয়েছেন, কিন্তু হিন্দু রোহিঙ্গা মহিলারা জানিয়েছেন যে, গ্যাসের চুলা পেলে তাদের অনেক সুবিধা হত, কারণ জ্বালানি কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে এবং রান্না করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। মুসলমান রোহিঙ্গারা যে ত্রাণ হিসাবে গ্যাসের চুলা পেয়েছেন তা তারা জানেন বলে জানিয়েছেন।

> “শেষবার যখন হাসপাতালে গিয়েছিলাম তখন একজন মুসলমান রোহিঙ্গার থেকে শুনেছিলাম যে তারা গ্যাসের চুলা পেয়েছে। কিন্তু আমরা তা পাই নি।”
>
> – নারী, ৩২, ক্যাম্প ১ (হিন্দু সম্প্রদায়)

নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা কী?

হিন্দু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় জানিয়েছে যে, তারা সুযোগ পেলে মায়ানমারেই ফিরে যেতে চাইবেন কারণ বাংলাদেশে তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। তারা একথাও বলেছে যে, মুসলমান রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে থাকাটা তাদের নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না, আর তাই যদি তারা নিজের দেশে ফিরে যেতে না পারেন তাহলে তারা ভারতে যেতে চান কারণ সেখানে প্রচুর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন।

> “আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল হবে যদি আমরা ভারতে গিয়ে থাকতে পারি, কারণ সেখানে বেশিরভাগ মানুষই আমাদের ধর্মের আর সংস্কৃতির দিক দিয়েও সেখানে আমদের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সহজ হবে।”
>
> – পুরুষ, ৪৫, ক্যাম্প ১ (হিন্দু সম্প্রদায়)

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।